কনৌজের অধিকার নিয়ে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে ত্রিকোণ সংঘর্ষ

উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র কনৌজের অধিকার নিয়ে যে ত্রিকোণ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল তা আদিমধ্য যুগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকাল হতেই কনৌজ উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অধিকন্তু হর্ষবর্ধন কনৌজকে রাজধানী করার ফলে কনৌজের মর্যাদা ও গুরুত্ব অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। কনৌজ 'মহোদয়শ্রী' নামে অভিহিত হয়। বিদেশিরাও মনে করত কনৌজ বা 'মহোদয়শ্রী' দখল করার অর্থ সমগ্র ভারতবর্ষের অধিকার অর্জন করা। কনৌজের এইরূপ রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের উদীয়মান তিন শক্তি যথা—বাংলা বিহারের পালরাজাগণ, মালব ও রাজপুতনার প্রতিহারগণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ প্রত্যেকে কনৌজ অধিকার করে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এরই ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র পাটলিপুত্রের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল পাটলিপুত্র হতে কনৌজে স্থানান্তরিত হয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তুলনামূলকভাবে সেই সময়কার কনৌজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে টিউটনিক বর্বরদের কাছে রোম যেমন ছিল আকর্ষণীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার বিবদমান জাতিগুলির কাছে ব্যাবিলন ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও ঈপ্সিত স্থান সেইরূপ ছিল সমকালীন রাজনীতিতে কনৌজের স্থান। তাই সেই সময়কার তিনটি উদীয়মান শক্তি কনৌজ অধিকারের জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত হয় যা আদিমধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে ত্রিকোণ সংঘর্ষ নামে পরিচিত। কনৌজ নিয়ে এই সংঘর্ষ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ ভাগ হতে নবম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের ক্রমপরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই সংগ্রামের তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় কনৌজের অধিকার নিয়ে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন পাল ও প্রতিহার রাজগণ। সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল পালরাজ ধর্মপাল ও প্রতিহাররাজ বৎস-এর মধ্যে। বৎসরাজ রাজপুতনা হতে ক্রমশ পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন। এর ফলে পালরাজ ধর্মপাল বিরোধিতা করতে থাকেন। কারণ ধর্মপাল পূর্ব ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পশ্চিম ভারতের দিকে অভিযান করে

কনৌজ অধিকার করার আশা পোষণ করতেন। আসলে উভয়েরই লক্ষ্য ছিল কনৌজ অধিকার। এর ফলে উভয় নরপতির মধ্যে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। এরপর বিজয়ী প্রতিহাররাজ বৎস কনৌজ অধিকার করে কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী ইন্দ্রায়ুধকে বসিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব উত্তর ভারতে শক্তিসাম্য বজায় রক্ষার্থে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান করে বান্দ্রার যুদ্ধে বৎসরাজকে পরাজিত করেন। এর ফলে বৎসরাজ রাজপুতনার মরুভূমিতে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এরপর ধ্রুব ধর্মপালের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করেন এবং এই অবস্থায় ধ্রুব ইচ্ছা করলে কনৌজ অধিকার করে উত্তর ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু সুদূর দক্ষিণ ভারত হতে উত্তর ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না বিবেচনা করে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব অনতিবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। এর ফলে ধর্মপাল বিনা বাধায় কনৌজ অধিকার করে কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রায়ুধকে বসান। কথিত আছে চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় উত্তর ভারতের সব নরপতিই উপস্থিত হয়ে তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। মালদহের সন্নিকটে খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসনে কনৌজে অনুষ্ঠিত রাজসভার ঘটনার বর্ণনা যেভাবে আছে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তার অর্থ করে বলেছেন যে উত্তর ভারতের সকল রাজাই উপস্থিত হয়ে ধন্য ধন্য করে ধর্মপালের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। এর ফলে কনৌজ তথা উত্তর ভারতে ধর্মপালের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খালিমপুরের তাম্রপট্টে বর্ণিত রাজদরবারের ঘটনাবলীর তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রামে দেখা যায় যে ধর্মপালের বিজয় গৌরব ও কনৌজের উপর তাঁর আধিপত্য একেবারে নিষ্কণ্টক হয় নাই। নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গের রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন। তিনি চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এরপর নাগভট্ট বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মুঙ্গেরের নিকট ধর্মপালকে পরাস্ত করেন। পাল সাম্রাজ্য যখন এইরূপ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন সেই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে আক্রমণ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। ফলে নাগভট্টকে স্বরাজ্য রক্ষা করার জন্য ফিরে যেতে হয়। ফলে সাম্রাজ্যও বিপদ হতে রক্ষা পায়। রাষ্ট্রকূট রাজগণের প্রশস্তি অনুসারে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়ে স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। যাইহোক, তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল কনৌজের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ত্রিকোণ সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে বা তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় যে ধর্মপালের মৃত্যুর পর ৮১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র দেবপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপালের তাম্রশাসন ও কেদার মিশ্রের পুত্র গুরুব মিশ্রের লিপি হতে জানা যায় যে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কনৌজ নিয়ে ত্রিদলীয় সংঘর্ষের শেষ পর্যায় আরম্ভ হয়। দেবপাল নাগভট্ট প্রতিহারের দুর্বল উত্তরাধিকারী রামভদ্রকে পরাজিত করেন। কিন্তু রামভদ্রের মৃত্যুর পর প্রতিহাররাজ মিহিরভোজ বা প্রথম ভোজ বুন্দেলখণ্ড ও রাজপুতনায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পালরাজ দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি কনৌজ ও কালিঞ্জর অধিকার করে কনৌজে প্রতিহার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই তথ্য আমরা ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রপট্ট থেকে পাই। প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ এরপর দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হলে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় ধ্রুব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হন। এর ফলে প্রতিহাররাজ ভোজের উত্তর ভারতে সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং কনৌজে দেবপালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে *গোয়ালিয়র লিপিতে* ভোজের জয়লাভের কথা উল্লেখ আছে। ড. মোমীন চৌধুরী মনে করেন প্রথমে হয়তো তিনি জয়ী হয়েছিলেন, পরে দেবপাল তাঁকে পরাজিত করেন।

কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর পালশক্তির অবক্ষয়ের সূচনা হয়। দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ যেমন ছিলেন দুর্বল, তেমনি অকর্মণ্য। নারায়ণপাল ও বিগ্রহপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট রাজগণ ক্রমাগত পালরাজ্য আক্রমণ করে পাল শক্তির পতন ত্বরান্বিত করে। এই সুযোগে প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ নারায়ণপালের দুর্বল হস্ত হতে কনৌজ অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের লেখ থেকে নারায়ণপালের দুর্বলতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ মগধ সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর ছয়টি লেখ পাটনায় এবং গয়ায় পাওয়া গেছে। এ থেকে নিশ্চিত বলা যায় মগধ তখন প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রতিহারগণের এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নিয়ে সুদীর্ঘ ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রামের অবসান ঘটে। এরপর এই ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রামে জয়লাভের স্মারক হিসাবে কনৌজে ভোজ তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তবে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধর্মপাল কনৌজ তথা উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁদের মতে ধর্মপাল যেভাবে প্রতিহারদের কাছে বার বার পরাজয় বরণ করছিলেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছিল এবং তিনি অধিরাজ ছিলেন কিনা তা একান্তই সন্দেহ।

কনৌজের অধিকার নিয়ে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের প্রায় এই দুশো বছরের সংগ্রামের ফলাফল ও রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। কিছুকালের মধ্যেই

প্রতিহার রাজবংশের উপর ঘোর অন্ধকার অমানিশা নেমে আসে। অপরদিকে তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজবংশে রক্তপাত শুরু হয়। উত্তর ভারতের অধিকার নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে কেউই লাভবান হয়নি। ত্রিশক্তিই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটে পড়েছিল। এই দীর্ঘকালীন সংগ্রামে যেভাবে তিনটি শক্তি নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেছিল তাতে কেউই সাম্রাজ্য স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি। এই ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। এই সুযোগে সীমান্ত রাজারা স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ সংগ্রামে তিন পক্ষই তিলে তিলে নিঃশেষ হয়েছিল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্তঃসারশূন্য অবস্থার সুযোগে ভারতবর্ষে মুসলমান বিজয়ের পথ প্রস্তুত হয়েছিল। আদিমধ্য যুগের ভারতবর্ষে এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্তঃসারশূন্য অবস্থার উপর সুলতান মামুদ বার বার আঘাত করে মহম্মদ ঘুরি কর্তৃক ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদ যখন কনৌজ অভিযান করেন তখন কনৌজের রাজা ছিলেন প্রতিহাররাজ ত্রিলোচনপাল। ত্রিলোচনপাল পলায়ন করেন এবং আত্মসমর্পণ করেন। সুলতান মামুদ কনৌজ অধিকার করেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র কনৌজের জৌলুস ম্লান হয়ে যায়।